Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual- Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
ISSN 2583-6706 (Online)
Volume-2 Issue-2 January 2024

কুলিকামিনের কথা
প্রসঙ্গ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কতিপয় ছোটোগল্প

গোপাল মুরমু

Link : https://bit.ly/3StaF7J

সারসংক্ষেপ : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় আসানসোল ও তার আশপাশের অঞ্চল নিয়ে যে গল্পগুলি রচনা করেছেন যেমন 'কয়লা-কুঠি', 'রেজিং রিপোর্ট','ফুল-দোল' প্রভৃতি গল্প অবলম্বনে কুলিকামিনদের নানা কথা আছে। যেমন কুলিকামিনদের নিয়ে যে বিচার ব্যবস্থা, বাৎসরিক কিছু পরব, তাদের দেহের গঠন, নারী-মনের কথা, অসার্থক প্রেম এবং সাহেব ও ম্যানেজারের বাস্তব চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তা নিয়ে কিছু কথা এই প্রবন্ধে আছে।

সূচক শব্দ : কুলিকামিন, কয়লাখনি, মালিকপক্ষ, সাহেব

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পিতৃগৃহ বীরভূম জেলায় আর মাতৃগৃহ পশ্চিম বর্ধমান জেলায় অবস্থিত। বীরভূম জেলার দুবরাজপুর শহরের নিকট হাটসেরান্দি গ্রাম পঞ্চায়েতের রূপসপুর গ্রামে তাঁর বাড়ি। তিনি ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ধরণীধর মুখোপাধ্যায়, মাতা হেমবরণী দেবী। পিতৃদত্ত নাম শ্যামলানন্দ, ডাক নাম শৈল। বালক শৈল মাকে হারান মাত্র তিন বছর বয়সে অর্থাৎ ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে। মাতার বিয়োগের পর পিতা পুনরায় বিবাহ করে। সেই কারণে তিনি অণ্ডালে দিদিমা কাদম্বরী দেবীর কাছে বড়ো হন। অণ্ডাল তাঁর মাতুলালয়। মাতামহের নাম মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন তৎকালীন কয়লাখনির একজন বড়ো ব্যবসায়ী, বসবাস করতেন কলকাতার সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে। শৈলজানন্দের প্রিয় বন্ধু ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। প্রথম দিকে নজরুল লিখতেন ছোটোগল্প আর শৈলজানন্দ কবিতা। পরে তাঁদের লেখার ধরন পালটে যায়। শৈলজানন্দের শ্বশুরালয় পশ্চিম বর্ধমানের ইকড়ায়। তাঁর পত্নীর নাম লীলাবতী দেবী। শ্বশুর ছিলেন তৎকালীন জমিদার, নাম করালীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। শৈলজানন্দ বিবাহের কিছু দিনের পরেই শ্বশুরালয়ে গিয়ে থাকতে শুরু করেন এবং শ্বশুর করালীপ্রসাদকে একটি কয়লার ডিপো করে দিতে বলেন। সেই সূত্রে শৈলজানন্দকে সাঁওতাল পরগনার বিভিন্ন সাঁওতাল গ্রামে গিয়ে কুলিকামিনের খোঁজ করতে হয়। এভাবেই তিনি কয়লাখনির কুলিকামিনের কথা নিয়ে 'কয়লা-কুঠি' নামে একটি ছোটোগল্প রচনা করেন। এটির প্রকাশকাল কার্তিক ১৩২৯ বঙ্গাব্দে 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায়। গল্পটি সম্পর্কে শৈলজানন্দ বলেছেন — "লিখলাম 'কয়লাকুঠি'। চারদিন লাগল গল্পটি শেষ করতে। আমার গল্পের একমাত্র শ্রোতা নজরুল। তাকে শোনালাম।... তারপর থেকেই আমি গল্পের পর গল্প লিখে চলেছি। আমার গল্পের সর্বপ্রথম পরিমণ্ডল কয়লাখনি এবং চরিত্রেরা সব সাঁওতাল কুলীমজুর।"[১]

এই 'কয়লা-কুঠি' নামক ছোটোগল্পে যে কুলিকামিনের কথা বলা হয়েছে তারা হলো – নানকু, বিলাসী, মাইনু, রমনা আর বিষণ। এই গল্পে বিলাসী নামে এক বাউরির মেয়ে নানকু নামে এক সাঁওতাল ছেলেকে জীবনাধিক ভালোবাসে এবং বিয়েও করে। বিয়ের পর তারা ঝরিয়া ছেড়ে জোড়জানকী কয়লাখনিতে কুলিকামিনের কাজ করে। দু'জনেই গোরুর মতো খাটে আর হাতির মতো মদ খেয়ে দিনাতিপাত করে। কাজের ফাঁকে যেদিন অবসর পায় সেদিন মাদল বাজিয়ে নাচ-গান করে আনন্দ করে। আবার আশেপাশে কোথাও মেলা হলে সেখানে গিয়েও মদ খেয়ে নাচ করে গান করে। এমনি একদিন শিয়াড়শোলে রথ দেখার নামে বিলাসী বাবুর কাছে তিন টাকা পেয়ে নানকুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। কিছু দূর গিয়ে নানকু তাড়ি খাওয়ার বাহানা করে বিলাসীকে যেতে বলে এবং তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে বলে আশ্বাস দেয়। কিন্তু সে আর ফিরে আসে না। পরে খবর নিয়ে জানা যায় যে, নানকু মাইনুর সঙ্গে পালিয়েছে। কিন্তু কোথায় গিয়েছে সে-সংবাদ কেউ দিতে পারেনি। বিলাসী তখন নিজেকে রক্ষা করার জন্য রমনার কাছে থাকতে শুরু করে। কারণ বিলাসী জানত যে, রমনা তাকে ভালোবাসে। কিন্তু বিলাসী রমনাকে বিয়ের সম্মতি দেয়নি। এভাবেই রমনার সঙ্গে নানকুহীন বিলাসীর দিন কাটতে থাকে। একদিন বিষণ নামে একটি ছেলে বিলাসীকে খবর দিল – "তোর নানকু এসেছে।আজ দু'দিন সে চার নম্বরে কাজ করছিল।" কিন্তু কয়লা তুলতে গিয়ে মাইনু মারা গেছে আর নানকু

এখনো খাদেই পড়ে আছে। বিলাসী তখন আকণ্ঠ মদ্যপান করে রমনাকে মিথ্যা কথা বলে নেশার ঘোরে রাতের অন্ধকারে কয়লাখনি নামক পাতালপুরীতে নামে এবং নানকুর মৃতদেহ পেয়ে নিজেও সেখানে সমাধিস্থ হয়।

গল্পটির মধ্য দিয়ে লেখক যেমন কয়লাখনির খেটে খাওয়া মুনিষের জ্বালাযন্ত্রণার ছবি অঙ্কন করেছেন তেমনি সেখানের কুলিকামিন নানকু, বিলাসী আর রমনার অকৃত্রিম প্রেমের কথাও ফুটিয়ে তুলেছেন। আবার এটাও মনে হয় যে, লেখক এই গল্পে উল্লেখিত 'আড়-বাঁশি' এবং 'কণ্ঠীর মালা' দিয়ে তৎকালীন বাংলা দেশের বৈষ্ণব ধর্মের দিকে ইশারাও করেছেন।

আমার পরবর্তী আলোচ্য গল্পটির নাম হলো 'রেজিং রিপোর্ট'। এটি 'প্রবাসী' পত্রিকায় ফাল্গুন মাসে ১৩২৯ বঙ্গাব্দে 'দিনমজুর' গল্পগ্রন্থে 'বিচার' নামে প্রকাশিত হয়। 'রেজিং' (Coal-raising) হলো কয়লা তোলা। আর লেখক জানিয়েছেন যে, খনি থেকে কয়লা তোলার যে মোট হিসাব মালিকের কাছে পাঠাতে হয়, তার নাম 'রেজিং রিপোর্ট'। এই গল্পে যে দু'জন কুলিকামিনের কথা পাওয়া যায় তারা হলো টুইলা ও তার স্ত্রী সোহাগী। লেখক এই গল্পে তাদের প্রেম ভালোবাসার কথা এবং টুইলা কীভাবে মারা যাচ্ছে সেই খবর আমাদের জানিয়েছেন। রেজিংবাবু চঞ্চলকুমার জানাচ্ছেন — "মিস্টার জেমসের কথা শুনিয়া, অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে-ই তো টুইলাকে এই বিপজ্জনক স্থানে কয়লা কাটিতে লাগাইয়া আসিয়াছিল এবং ভালো করিয়া দেখিতে গেলে, সে-ই হতভাগ্যের মৃত্যুর কারণ।"[২] কিন্তু কয়লাখনির বৃদ্ধ ম্যানেজার মিস্টার জেমস মিথ্যা সাক্ষীর দ্বারা টুইলাকে মাইনস ইন্সপেক্টরের কাছে চোর প্রমাণ করেছে। টুইলা চোর নয়, সে রেজিংবাবুর নির্দেশে তেরো নম্বর কাঁথিতে কাজ করতে গিয়েছিল। আসলে টুইলাকে খুন করা হয়েছে। আর মিস্টার জেমসও চঞ্চলকুমার বাবুকে বলেছে — "কুছ পরোয়া নেই। এমন কত খুন হয়ে গিয়েছে আমার হাতে।"[৩] আবার চঞ্চলকুমার যখন মৃত টুইলার স্ত্রী সোহাগীর জন্য সাহায্যের কথা বলেছে তখন সাহেব স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে, সে কোম্পানির বাজে খরচ হতে দেবে না। খাটবে খাবে। You have nothing to do with it. এই ঘটনার পর চঞ্চলকুমারকে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো। যাওয়ার সময় চঞ্চলকুমার নিজের মাইনের থেকে পঞ্চাশ টাকা সোহাগীকে কোম্পানির নামে দিয়ে গেল।

এই গল্পে কয়লাখনির মালিকপক্ষ দ্বারা কুলিকামিনের উপর নির্মম অত্যাচারের চিত্র আমাদের সামনে ফুটে উঠেছে। সাহেবের একমাত্র লক্ষ্য মুনাফা। তার জন্য সে মানুষ খুন করেছে। এই কাজের জন্য তার মনে কোনো মানবিকতা বা পাপবোধ বিন্দুমাত্র ছিল না যা চঞ্চলকুমারের মধ্যে ছিল। কিন্তু সাহেব এটা কেন করতে পারল? সাহসের জন্য, ক্ষমতার জন্য। কীসের ক্ষমতা? টাকার। সাহেবের মতো মালিকপক্ষ সব কিছু টাকা দিয়ে ঢাকা রাখতে পারে। লেখক এই গল্পে শ্রমিক আর মালিকের তফাত-রেখা নির্ণয় করেছেন। কয়লাখনির কুলিকামিন এখানে একটি সংখ্যা মাত্র। কুলিকামিনের স্থান জুতোর নীচে। যখন-তখন মারা যেতে পারে।

'ফুল-দোল' গল্পের প্রধান চরিত্র পুনকা। সে খুবই গরীব। একদিন কাজ না করলে খাবার জোটে না। তাই তাকে বাধ্য হয়ে বসন্তোৎসবের দিনেও কয়লাখনির পাতালপুরীতে না খেয়ে সারাক্ষণ কয়লা কাটতে হয়েছে। কাজের ফাঁকে যখন সে একটু বিশ্রামের জন্য বসেছিল তখন কয়লাখনির ম্যানেজার তাকে স-বুট পদাঘাত করেছে। আর পুনকা কোনোরকম প্রতিক্রিয়া না জানিয়ে সহ্য করেছে, তার গায়ে বল ছিল না বলে নয়। সে লাথি সহ্য করেছে এক টাকার জন্য। পুনকার গায়ে জোর ছিল বলেই সুখী তাকে ভালোবাসে। আবার পুনকা এটাও জানে যে, এই দিনেই সুখীর বিয়ে। পুনকা এবং সুখী দু'জন দু'জনকে মনে প্রাণে ভালোবাসে। কিন্তু পুনকা এতই গরীব যে, তার কিছুই নেই। সেই কারণে সখীর বাবা পুনকার সঙ্গে সখীর বিয়ে দিতে রাজি নয়। অন্যদিকে পুনকার বারবার মনে পড়ছে কাবলিওয়ালার অত্যাচারের কথা। সে চার টাকার জন্য পুনকার বৃদ্ধ বাবাকে মারধর করে গেছে যখন পুনকা বসন্তোৎসবের জন্য সুখীর সঙ্গে ফুল তুলতে গিয়েছিল। পেটের জন্য প্রাণ এবং ভালোবাসা কত সহজে চলে যেতে পারে তার চিত্র এই গল্পে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

'রাঙা-শাড়ি' গল্পে লুটন মাঝি নামে একজন কুলি, আশ্বিন মাসের পুজোর জন্য একখানি রাঙা শাড়ি যোগাড়ের উদ্দেশ্যে কয়লাখনির বন্ধ গ্যালারি'র কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে ঝোলা-কয়লা (hanging coal) চুরি করে কাটতে থাকে। এমন সময় একটা প্রকাণ্ড কয়লার চাংড়া উপর থেকে পড়ে লুটনের হাত দুটো পুরোপুরি জখম করে দিল। এই ঘটনার দু'একদিন পর দেখা গেল যে, লুটনের কুকুর 'জিন্না' ছাড়া তার কাছে আর কেউ নেই। এমন কী যার জন্য তার আজ এই অবস্থা সে-ই লুটনীর বিয়ের ব্যবস্থা চলছে পান্টুর সঙ্গে। কারণ পান্টু বিয়েতে দু'কুড়ি টাকা খরচ করবে। এই গল্পে লেখক লুটনকে কয়লা চোর হিসেবে দেখিয়েছেন। আর এই কর্মে সে নিজেকে খুব দক্ষ মনে করে এবং কয়লা চুরি করেই ভাতের যোগাড় করে। তাই লুটন বলছে "লুটনী, আমরা জুয়ান বেটাছেলে, সুখ-সোয়াস্তির জন্য আমরা যা খুশি তাই করব। উসব না করলে দুবেলা পেট ভরে খেতেই পাব নাই — তা জানিস?"[৪] লেখক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এই গল্পের মধ্য দিয়ে কয়লাখনির এক শ্রেণির যুবক-কুলির কথা বলেছেন,

যারা খনি থেকে কয়লা চুরি করার ব্যাপারটিকে নিজেদের সাহস ও ক্ষমতা প্রদর্শন হিসেবে মনে করে।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় 'বলিদান' গল্পে কয়লাখনির সাহেব ও তাঁর একটি কুকুরের চরিত্র এক ফ্রেমে ফুটিয়ে তুলেছেন। সাহেব তাঁর পোষ্য কুকুরটির নাম রেখেছেন Tiger। সাহেব-এর নির্দেশে ও ম্যানেজার-এর আদেশে লাকু এবং তার স্ত্রী টগরী যখন জ্বলন্ত কয়লাখনিতে আগুন নেভাতে ব্যস্ত তখন কুকুরটি সকলের চক্ষু এড়িয়ে গাছের তলায় ঘুমন্ত শিশুপুত্রকে মেরে ফেলেছে। এই শিশুটি ছিল লাকু ও টগরীর। আবার সাহেব এটাও জানে যে, জ্বলন্ত কয়লাখনিতে নামা মানে মৃত্যুর কাছাকাছি যাওয়া। আর সেটাই হলো — লাকু মারা গেল। ডবল মজুরির লোভ দেখিয়ে সাহেব লাকুকে খুন করেছে। সাহেব খুব ভালোভাবেই জানে যে, এই খুনের জন্য তাঁর কিছুই হবে না। টগরী বোঙাকে (দেবতা) সন্তুষ্ট করার জন্য একটি মুরগি বলি দিতে চেয়েছিল। কিন্তু লাকু এবং তার শিশুপুত্র যখন সাহেবের জন্য মারা গেল তখন টগরী সেই মুরগি সাহেবকে দিয়ে এলো। এই গল্পে সাহেবের স্বার্থের জন্য কুলিকামিনের জীবন কীভাবে বলিদান দিতে হয় তার চিত্র ফুটে উঠেছে।

মইনু নামে এক মেয়ের প্রেম-কথা নিয়ে রচিত 'রহস্যময়ী' গল্প। হাজারিবাগ-এর একজন তরুণ ইঞ্জিনিয়ার সাহেব মইনুকে প্রাণপণ ভালোবাসে। তা সত্ত্বেও মইনুকে সেখান থেকে পালিয়ে আসতে হলো। কারণ মইনু সাহেবকে ভালোবাসে না এমন নয়। সেও সাহেবকে মনেপ্রাণে ভালোবাসে। কিন্তু মইনু তার মা-এর দেওয়া কথার জন্য সাহেবকে বিয়ে করতে পারে না। মইনুর মাও সাহেবকে বিয়ে করেছিল। তাঁদেরই সন্তান সে। পরে মেমসাহেবের সঙ্গে সাহেব সংসার বাঁধে আর মইনুদের সে ছেড়ে দেয়। তখন থেকেই মা-মেয়েতে এখানে-ওখানে পালাতে থাকে। মা মারা যাওয়ার সময় মইনুকে বলে গেছে — "আর যা করিস করবি মইনু, কিন্তু কালো চামড়ার সাঁওতাল আমরা — সাদা চামড়ার সাহেবের সঙ্গে কোনোদিন ভাব করতে যাস না।"[৫] তাই মইনু সাহেবকে ধরা না দেওয়ার জন্য পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এই গল্পের মধ্য দিয়ে রহস্যময়ী নারীমনের অনুসন্ধান করেছেন।

আরেকটি গল্পের নাম 'ঝুমরু'। বর্ষা কালের জন্য ছাতার প্রয়োজন। কিন্তু সেই ছাতা কেনার মতো টাকা নেই। তাই রূপসা কয়লাকুঠির সাঁওতাল কুলিকামিনরা ঠিক করল যে, তারা পাতা দিয়ে ছাতা তৈরি করবে। সেই মতো তারা ছুটির দিন ফরিদপুর জঙ্গলে শিয়াড়ি পাতা আনতে যায়। সেই দিন সকলের সঙ্গে গিয়ে ছিল ঝুমরু ও মতি। ঝুমরু হলো লছি সর্দার ও তার স্ত্রী দাসীর পালিতপুত্র। তারা ঝুমরুকে কুড়িয়ে পেয়েছিল। মতি হলো লোটন মাঝির কন্যা। ফরিদপুর জঙ্গলে ছাতার জন্য পাতা সংগ্রহের কথা ভুলে গিয়ে ঝুমরু ও মতি সকলকে ফাঁকি দিয়ে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে প্রেম করতে থাকে। এ দিকে লোটন মাঝি তার কন্যা মতিকে দেখতে না পেয়ে জঙ্গলে খুঁজতে থাকে। পরে যখন তাদের দেখতে পেল তখন লোটন মাঝি মতিকে ঝুমরুর কাছ থেকে টানতে টানতে রূপসা কয়লাকুঠির ধাওড়ায় নিয়ে আসে। ঝুমরু ও মতি দু'জন দু'জনকে ভালোবাসে। আবার লোটন মাঝিরও ইচ্ছা ঝুমরুর সঙ্গেই মতির বিয়ে দিয়ে দেওয়া। কিন্তু টাকার অভাবে বিয়েটা হয় না। কারণ বিয়ের সমস্ত খরচখরচা পাত্রপক্ষকেই করতে হয়। এদিকে লছির স্ত্রী দাসী বিয়ের টাকা দিতে রাজি হলেও লছি সর্দার রাজি ছিল না। ঝুমরু তখন লছি, দাসী এবং মতিকে ছেড়ে পালিয়ে যায়।

এই গল্পে ঝুমরু ও মতির প্রেম এবং নির্জন জঙ্গলের রোমান্টিক পরিবেশ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। আবার অভাব কাকে বলে তার চিত্র আভাসিত হয়েছে ছাতার জন্য পাতা সংগ্রহ এবং ঝুমরু ও মতির বিয়ে না হওয়ার মধ্য দিয়ে।

'কালো-কালো মানুষ' গল্পটির মধ্য দিয়ে লেখক কয়লাখনির রাতের অন্ধকারের পরিবেশের চিত্র মানা-বুড়ির কথায় আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তার কথায় — এই কোলিয়ারিতে এক সর্বনেশে ব্যাপার আছে, তা হলো মদ আর মেয়েমানুষ — দুটোই হচ্ছে নেশার জিনিস। তার জন্যই এখানকার মানুষগুলি হন্যে হয়ে সবসময় ঘুরে বেড়ায়। তাই মানার মা মানা-বুড়ি আক্ষেপ প্রকাশ করে বলে — "মর্ মর্, তোরা মরে যা! মানুষের মতন মানুষ আসুক। দুনিয়ার চেহারাটা বদলে যাক।"[৬]

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের যতগুলি ছোটোগল্প আলোচনা করলাম সেগুলির পটভূমি হলো আসানসোল ও তার আশপাশের কয়লাখনি। আর সেই কয়লাখনির কুলিকামিনরা হলো সাঁওতাল, বাউরি শ্রেণির মানুষ। কয়লাখনিতে দিনরাত তারা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে যে পারিশ্রমিক পায় তার বেশির ভাগ মদ খেয়ে উড়িয়ে দেয়। খেটে খাওয়ার মধ্য দিয়ে কুলিকামিনরা মানবজীবনের আদিমতার পরিচয় বহন করে চলেছে। ভবিষ্যতের জন্য অর্থ সঞ্চয় করে রাখার তাগিদ তাদের নেই। লেখক কয়লাখনির কুলিকামিনের বিচার ব্যবস্থা, বাৎসরিক কিছু পরব, তাদের দেহের গঠন, নারী-মনের কথা, অসার্থক প্রেম এবং সাহেব ও ম্যানেজারের বাস্তব চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। গড়পড়তা কুলিকামিনের চিন্তা — আহারের জোগাড় করা আর আদিম জৈবিকতায় মৈথুন — এতে সীমাবদ্ধ। তবে এর মধ্যে যে ছক ভাঙার ছবি এবং মানবতার ছবি আছে তাও তুলে ধরেছেন লেখক।

তথ্য সূত্র :

১। 'গল্পসমগ্র', শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, ২য় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৪২৩, সম্পাদকের নিবেদন, পৃ. ৫
২। 'গল্পসমগ্র',, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, ৩য় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৪২৪, পৃ. ২৬৬
৩। ওই, পৃ. ২৬৫
৪। ওই, পৃ. ৯৪
৫। ওই, পৃ. ৩০০
৬। ওই, পৃ. ৩২৮

সহায়ক গ্রন্থ :

১। সঞ্জীব দাস, 'বাস্তববাদের বহুরূপ ও শৈলজানন্দের কথাসাহিত্য', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ, মহালয়া ২০১১
২। বাঁধন সেনগুপ্ত, 'শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়', সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লী ১০০০০১, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১৩
৩। হরিচাঁদ দাস, 'শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের গল্প : রাঢ়বঙ্গের জনজীবন ও সংস্কৃতি', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ, অগস্ট ২০১৮
৪। সন্তোষকুমার বিশ্বাস, 'শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য', পাত্র বুক স্টল, ৯, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০ ১২, দ্বিতীয় প্রকাশ, বইমেলা ২০০৫
৫। শিশিরকুমার দাশ, 'বাংলা ছোটগল্প' (১৮৭৩-১৯২৩), দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পুনর্মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১৬
৬। ভূদেব চৌধুরী, 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার', মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পুনর্মুদ্রণ ২০১৭-১৮

সহায়ক গ্রন্থ :

১। 'পশ্চিমবঙ্গ', শৈলজানন্দ জন্মশতবর্ষ বিশেষ সংখ্যা, প্রধান সম্পাদক তারাপদ ঘোষ, সম্পাদক অজিত মণ্ডল, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মার্চ ২০০১

লেখক পরিচিতি :

গোপাল মুরমু : পেশায় শিক্ষক। প্রাবন্ধিক। বর্তমানে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক।